প্রকাশক :

ডি. মেহ্‌রা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১

৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১

১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

প্রচ্ছদশিল্পী :

গণেশ বসু

মুদ্রক :

মনোতোষ পোদ্দার

শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন

কলকাতা-৯

প্রকাশকের নিবেদন

'আমবা আবহমান ধ্বংসে ও নির্মাণে' কাব্যগ্রন্থটি এবং 'একালের রক্তকববী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভাস্কর্যেব ভাঙা হাত'—এই দুটিকে একত্র কবে *কাব্যনাট্য* নামে প্রকাশ কবার ইচ্ছা ছিল পূর্ণেন্দুদার। এর জন্য নতুন করে ছবি এঁকে দেবাব কথাও ভেবেছিলেন তিনি। *কাব্যনাট্য* প্রকাশিত হলেও তাঁর পরবর্তী ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল—নতুন করে ছবি আঁকা আর হয়ে উঠল না।

এ-বইয়ের প্রথমাংশ প্রথম সংস্করণেব অনুরূপ; কেননা ছবি ও তাব ব্যবহাব সম্বন্ধে পূর্ণেন্দুদাব নিজস্ব কিছু ভাবনা-চিন্তা ছিল। শেষাংশেব ছবিগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছেন কবি-কন্যা উপমা পত্রী—তাঁকে কৃতজ্ঞতা।

সুধাংশুশেখর দে

আমরা আবহমান ধ্বংসে ও নির্মাণে

নন্দিনীর কাছে
পৌঁছতে না পারার কারণ

....

নন্দিনী

চিল উড়ে গেলেও
ছায়ার চিলতে রেখে যায়
কাপাস ক্ষেতে কিংবা
ঢালু পাহাড়ের স্তনচূড়ায়।
আর আপনি,
আপনার মশাই দিনরাত কী এত কাজ বলুন তো?
মহাভারত-টহাভারত, এপিক?
বাল্মীকি মুনি হয়ে যাচ্ছেন নাকি?
আধ মিনিটের দেখা দিতেই আট মাস?
আপনি কি ডানা আঁটছেন শিকড়ের পিঠে?
নাকি, ডানার পিঠেই সেলাই করছেন শিকড়?
কী জানি বাবা, যা কেরামতি আপনাদের
সব ভেলকিই তো হাতের মুঠোয়
হয়তো শুনব
বাতাসকে বেঠোফেনের স্বরলিপি
সি মাইনর, সোনাটার মর্মর

কিংবা দেবদারুকে ছৌ নাচের দ্রিম দা দা দ্রিম দা।
জাদুকর পি. সি. সরকার কবি ছিলেন কিনা জানি না
তবে আপনার মতো কবিদের হালচাল দেখে মনে হয়
সব কবিরাই জাদুকর
সত্যিকে মিথ্যের লাল নীল রুমাল
কিংবা মিথ্যেকে সত্যির সাদা পায়রা বানাতে
যাকে বলে ওস্তাদ।
কী দরকার অত ছল-ছুতোর?
মুখ ফুটে বলে দিলেই তো পারেন মশাই যে
নন্দিনী
তুমি এখন আমার কাছে গলে-যাওয়া মোম
কিংবা পিদিমের পোড়া সলতে
তোমার আলোয় আর আগের মতো সাতশো মানিক
খুঁজে পাই না আমি।
ফুরিয়ে-যাওয়া এক বহ্ন্যুৎসব তুমি এখন।
গত আটমাসে আপনাকে কমসে কম
টেলিফোন করেছি আট নং বাহাত্তরবার।
তা ছাড়া সাধন বর্ণালী রাখাল চিনু
যখন যাকে কাছে পেয়েছি
চিঠিতে চিরকুটে সবিনয় নিবেদন
লিখতে লিখতে হাতে জ্বর, বলতে বলতে মুখে পোকা
থুতু শুকিয়ে কাঠ।
দুনিয়ায় আর কখনো কেউ কাজ করেনি
লেখেনি
আঁকেনি
যুদ্ধ করেনি
আপনিই পয়লা নম্বর।
সত্যি, যা দেখালেন!
এ রকম কিছুদিন চললে আপনিও হয়তো মহাকবি গ্যেটে
গ্যেটে না গয়টে, গয়টে না গয়ঠে

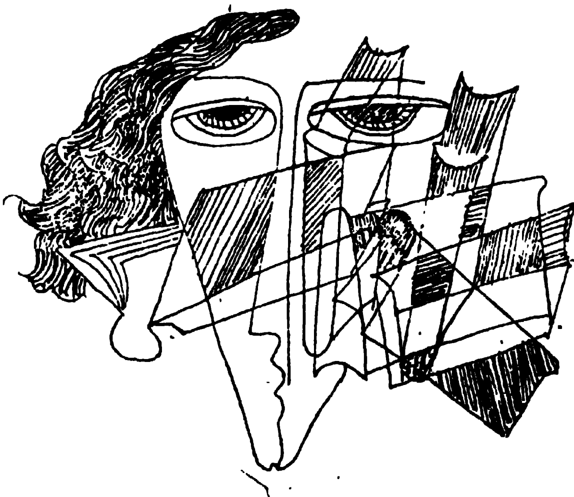


গয়ঠে না গয়েতে
ঈশ্বর জানেন ঠিক নামটা কী
সে যাই হোক, ঐরকম এক মহাপুরুষ।
তারপর আপনার নামে স্ট্যাচু, রাস্তা, জুতোর দোকান,
অধ্যাপকের নোট বই, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার।
তবে আর কি?
মহারাজ শুভঙ্কর বাহাদুর কী জয়!
আর আমি কোথাকার-কে হরিদাসী বোষ্টুমী
চোখে ভিক্ষের ঝুলি
গলায় খঞ্জনী বাজিয়ে গান
—নিঠুর হে...

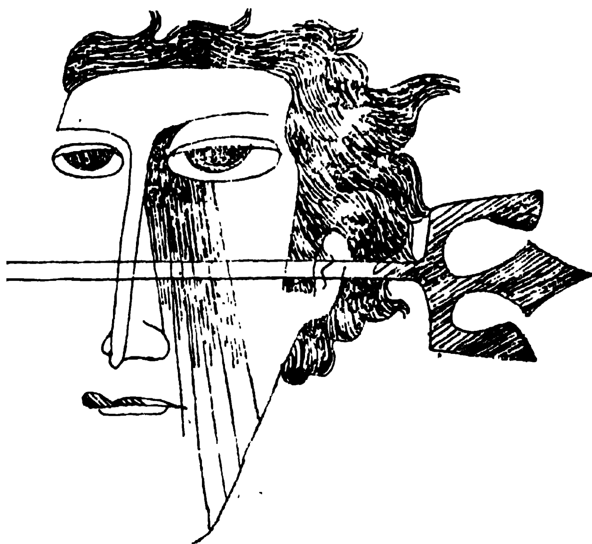
শুভঙ্কর

তোমার নক্ষত্র-ইশারা
নীল ঘুড়ির মতো এখনো আমার জানলায়।
তোমার শাঁখ এখনো ঝন্‌ঝন্‌ আমার টেলিফানে।
তুমি অপেক্ষায় পাথর
সে ভাস্কর্য ঠিকই দেখতে পাই আমি।
দিগদিগন্তকে নিংড়ে তোমার চাউনী
জলরেখাময় পথগুলোকে
তুমি সরে যেতে বলেছ শালবনের ওধারে
তোমার নিষেধে
ঝড়-বৃষ্টি ফিরে গেছে দমকলের ঘণ্টা বাজিয়ে
তোমার শাসনে
হিংস্র শ্বাপদেরাও শান্ত মমি
এমন-কি তুমি গাছপালাদের হুকুম দিয়েছ
রাস্তার দুধারে গৌড়ের খিলান সাজাতে
সবই কানে এসেছে আমার।
কিন্তু বিশ্বাস করো নন্দিনী
সত্যি, কী বাজে, বিতিকিচ্ছিরী ঝামেলায় যে জড়িয়ে
ঠিক যেন বাড়িবদল
সমস্ত সাজানো কিছুকে ভেঙে ছত্রখান করে
সেই সব লণ্ডভণ্ডকে
আবার গুছিয়ে তোলার হাড়-হিম খাটনি
এই আমার কাজ এখন, একমাত্র,
বলতে গেলে নিত্যনৈমিত্তিক।
আমাকে ফিরে আসতে হচ্ছে পুরোনো সেই ঘরে
ঘর অথবা দুর্গ
দুর্গ যা অসংখ্য প্রশ্নচিহ্নময় ফাটলে চৌচির
কিন্তু যেহেতু বিশ্বাসের সঙ্গে সেইখানেই প্রথম পরিচয়
প্রথম অস্ত্রে দীক্ষা এবং প্রথম লক্ষ্যভেদ

ফিরে আসতেই হচ্ছে সেখানে
যেহেতু অজস্র মৃত মানুষের স্বপ্নবীজ তাকিয়ে আছে
আমার দিকে
তাকিয়ে আছে, যেহেতু তাদের কাছে
একদা বুক চিতিয়ে উচ্চারণ করেছিলাম এই প্রতিজ্ঞা
—জীবন এবং জিজ্ঞাসা থেকে এক পা সরব না কখনো।
কে বললে আমি বাতাসকে বেঠোফেন
দেবদারুকে ছৌ নাচ
যাঃ
ওসব ফাজিল ঠোঁটের রচনা।
মূলত নিজেকে নিয়েই
নিজের হাঁটাচলার রাস্তা
রাস্তা না বলে বলতে পারো জলস্রোত
জলস্রোতও এক ধরনের রাস্তা, সমুদ্র পাড়ির।
এমনকি জ্বলন্ত ধাতু উদগীরণ করে যে আগুনে-পাহাড়
কিংবা কাঁচা রক্ত-মাংস বমি করে যে-সব যুদ্ধ
তারাও রাস্তা ছাড়া কীই বা গড়ে আর?
মরা থেকে বাঁচার ভিন্নতর রাস্তা।



হ্যাঁ, যা বলছিলাম
দেবদারু-টেবদারু ওসব বাজে কথা
মূলত নিজেকে নিয়েই
আর সত্যি কথা বলতে মানুষের সবচেয়ে নিজের লোক বলতে তো
সে নিজেই
এমন-কি নিকটতম শত্রু বলতেও সেই-ই
কেননা সেই তো সর্বক্ষণ সামনে,
সে বা তার ছায়া, অথবা মুখোশ
প্রয়োজনে সেই-ই হাত-বাড়ানো আলিঙ্গন
প্রয়োজনে হাতের শিরায় আড়াল-করা ছুরির ঘা।
নিজের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধ যে কী ভয়ংকর
বিশেষ করে সেই মানুষের যে উত্তীর্ণ হতে চায় ক্রমশ
যার লক্ষ দুর্গম এক চূড়া
অথচ কখনো গুনে দেখেনি সিঁড়ির ধাপ
অথবা জানে না যে সিঁড়ির ধাপগুলো
পোকা-খাওয়া দাঁতের মতো ভাঙা এবং
পাতাল-মুখো খাদের দিকে ঢালু।
সত্যি, নিজেকে এক ঠিকানা থেকে আরেক ঠিকানায়
পৌঁছে দেওয়ার যে কী ত্রিশূল-বেঁধা কষ্ট
অষ্টপ্রহরের চাবুক
অতৃপ্তি, অরুচি
অশৌচ-পালনের মতো উপবাসময় যেন।
আমাকে এখন নিজের ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতেই
যন্ত্রচালিত আমি,
কেনা গোলাম।
কি বলব একে? কাজ?
অথচ ঠিক কোন্‌খানে তার শুরু
অর্থাৎ কাজের কোন্ দিকটা শিকড়
আর কোন্ দিকে ফলফুলের ডালপালা
সঠিক জানা থাকত যদি



কত আরামেরই না হতো রাত্রির ঘুম।
ঘুমও এখন আমার কাছে দুর্ঘটনা
ঘুমের স্বপ্নগুলোও সোনালি দাঁতের কুকুর
উঃ, কী যে হাড়-মড়মড় শব্দ স্বপ্নের ভিতরে।
অথচ স্বপ্নের কুকুরগুলোও ঠিক কুকুরের মতো নয়
শয়তানের বাচ্চা
আবার তাদের যে শয়তানের বাচ্চা বলে লাথি মারব
তারও উপায় নেই
কেননা তাদের ঘাড়ে-গদ্দানে হুবহু মানুষের মতোই
সাদা পাঞ্জাবি কিংবা র-সিল্কের টাই
চোখে বাই-ফোকাল
গালে আফটার শেভিং-এর বকুলগন্ধ
মুখে ভেলভেট হাসি
আগাগোড়া মেরুন রেক্সিনে বাঁধাই যেন
এবং অফসেটে ছাপা বহুবর্ণময়।

নন্দিনী

সেদিন ছিল শনিবার।
আমার মনে ঘুঙুর বেজে উঠল হঠাৎ।
তুমি তাহলে নিশ্চয়ই আসছ।
সারাদিন নিজেকে আছড়ে-কাছড়ে কাচাকাচি
মন থেকে গুমরোনো কষ্টের কষ
রাগ, দুঃখ, অভিমানের তেলচিটে
সব ঘষে-মেজে, শুকিয়ে, ইস্ত্রি করে পরিপাটি।
আলমারী-ওয়ার্ডরোব ঘেঁটে-ঘুঁটে
সব চেয়ে দামী অভ্যর্থনা
তুমি ম্যাজেন্টা ভালোবাসো
শাড়িতে সেই রঙ
তুমি বর্ষা দেখতে পাগল
তাই চোখের চারপাশে কাজল-পরা মেঘ
বিয়ের আগের বালুচরী-হাসি
যা আয়না থেকে খসে পড়েছিল অনেকদিন, আবার আয়নায় এঁটে
পরিশ্রান্ত হয়ে আসছ
বিছানা একটু নরম না হলে লাগবে
তাই আঁচলের ঘের কমিয়ে
তুলতুলে দুটো বালিশ
এইভাবে দিগ্‌বিদিক জেগে বসে।
মীর্জাপুরের চাঁদ যাচ্ছিল গড়িয়াহাটায়
হঠাৎ দেখি আমার জানলায়।
—ঠাকুরঝি!
অন্য দিন এ-সময় না চুলে চিরুনি, না চোখে পিদিম
আজ যে একদম মখমলে মখমলে আরব্য উপন্যাসের শাহাজাদী!
কী ব্যাপার?
মনের মানুষ-টানুষ কেউ?
তার উপরে আবার এসরাজের মীড়।



আমি তো শুনে হেসে কুটিকুটি।
—তুই মুখপুড়ি আবার এসরাজ পেলি কোত্থেকে?
—ওমা! ঐ তো বাজছে তোমারই রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
ছায়াবীথিকায়, কুঁড়িতে, পরাগে।
গভীর এবং স্তব্ধ সমুদ্রের মাঝরাতে
অনেকবার এই এসরাজ শুনেছি আমি
অন্ধকার তার সমস্ত ব্যথা নিয়ে জলের উপর উপুড়
আর লাখো লাখো জলপরী
তাদের গায়ের আঁশে মুক্তো-স্ফুলিঙ্গ
অন্ধকার যাতে সমুদ্রকে কাছে পায়,
তাদের চুম্বনে আলিঙ্গনে
কোথাও যেন থেকে না যায় দীর্ঘশ্বাসের ফাঁক,
সেইভাবেই তারা অর্থাৎ জলপরীরা

সাজিয়ে চলেছে ফুলশয্যার খাট।
ভালোবাসা কতটা বর্ষা-বাদলে ভিজলে এসরাজের কান্না হয়
সে আবার তোর কাছে শিখব নাকি?.

মুখে মিহি জর্দা চিবোতে চিবোতে
চাঁদ চলে গেল দখিনের পথে
তার মুচকি হাসির ওড়নাটাকে
আমার মাথায় ঘোমটার মতো পরিয়ে।
জানি ভাজ পড়েছে তোমার ভুরুতে।
ভাবছ তোমাকে কাছে টানার গরজে
এসব যেন এলেবেলে বানানো কথার হাতছানি।

শুভঙ্কর

আবার ভুল বুঝছ আমাকে।
আমি যখন নিজেকে গড়ি
তখন একই সঙ্গে গড়া হতে থাকে
তোমারও প্রতিমা।

নন্দিনী

কী দিয়ে গড়ো তুমি আমাকে?
অক্ষরে, ছন্দে, উপমায়, অলংকারে
সাদা কাগজে কালো কালির আঁচড়ে?
কিন্তু তোমার মতো অমরত্বের তৃষ্ণায় আমি কাতর নই,
শুভঙ্কর!
আমি শুধু তোমাকেই চাই, তুমি যেমন ঠিক তেমনিই।
তুমি বলবে, আমি যে বড় ভাঙাচোরা নন্দিনী,
আমি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির মতো কাটা-ছেঁড়ায় জীর্ণ।

হোক,
সেই তুমিই আমার স্বপ্ন।

শুভঙ্কর

তোমাকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছে করে নন্দিনী
কেননা এখনো কত সরল রয়ে গেছ তুমি
এখনো 'স্বপ্ন' শব্দটাকে উচ্চারণ করতে পারো
কত মমতা দিয়ে
যেন সত্যিই ওর অর্থ আছে কোনো।
যেন মন্ত্রের মতো ক্ষমতাবান।

নন্দিনী

অথচ নিজের খাঁ খাঁ মাঠের দৈন্যে যখন আমি দীর্ণ
আমার রক্ত-স্পন্দনের ভিতরে
তুমিই নাচিয়ে দিয়েছিলে এই শব্দ।

শুভঙ্কর

মনে আছে।
শব্দটার সঙ্গে আমারও তখন সদ্য পরিচয়
তখন ভাবতাম
'চিচিং ফাঁক'-এর মতো এও এক ঐন্দ্রজালিক শব্দ
একের পর এক খুলে দেবে পাথরের দরজা
অনায়াস যাতায়াতের পথে কোথাও উঁচিয়ে নেই
বর্শা-বল্লমের সন্দেহপ্রবণতা।
ভীমরুল-অন্ধকারে একবার উচ্চারণ করতে পারলেই
উজাড় করে দেবে মণি-মুক্তোর ভোর।
এখন স্বপ্নের কথা উঠলে

আমার নাড়ির ভিতরে ঘুলিয়ে ওঠে ঘৃণা।
যে-মানুষ একবার কোনো একটা স্বপ্নকে দেখিয়ে দিয়েছে
অন্দরমহলের শ্বেতপাথর সিঁড়ির ধাপ
তার কপালে তখুনি পড়ল উদ্ধারহীন যন্ত্রণার রক্ত-টিপ।
সে আর কোনোদিন নিজের ছন্নছাড়া চুলকে
বাঁধতে পারবে না শাসনে
এমন-কি চিরুনিটা যদি হয় সোনা-দিয়ে-বাঁধানো।
স্বপ্ন যে এত বেইমান
সে যে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো কেবলই
এক যুদ্ধ থেকে আর-এক যুদ্ধের মারাত্মক রঙ্গমঞ্চে
আগে জানলে ওর ছায়ার আটচল্লিশ হাত দূর দিয়ে
ওর লাইসেন্স, পাসপোর্ট, আইডেনটিটি কার্ড
সব কেড়ে-ছিড়ে...

নন্দিনী

এ তুমি কার গলায় কথা বলছ শুভঙ্কর?

শুভঙ্কর

তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে কোনো অপদেবতার?

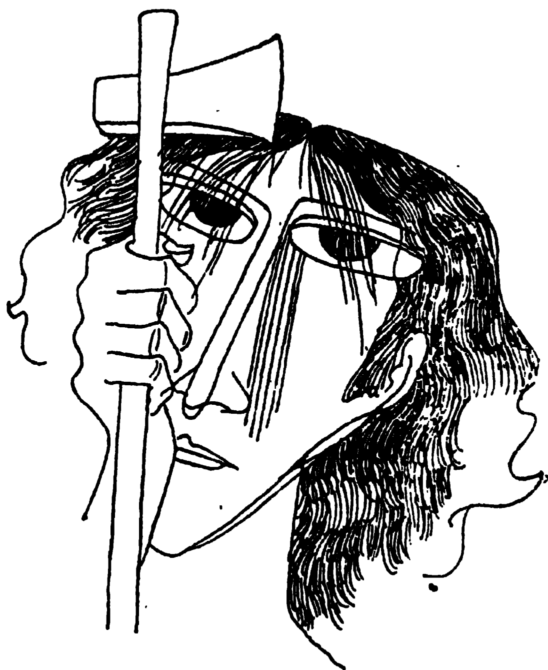
নন্দিনী

আগে কখনো তোমার গলায় শুনিনি
এমন নদীর পাড়-ভাঙার শব্দ।

শুভঙ্কর

কিন্তু একটু মন দিয়ে শুনলে বুঝতে

ওটা কোনো ভাঙাভাঙির শব্দ নয়,
ঝিল্লীরব।
মানুষকে মেরেছে তার ইচ্ছে
একটা কিছু হয়ে-ওঠার অখণ্ড ঝিল্লীরব,
সাধুভাষায় যাকে বলি আকাঙ্ক্ষা
ইংরেজিতে— ডিজায়ার
'ডিজায়ার অফ দা মথ ফর দা স্টার'— সেই ডিজায়ার
কিংবা রবীন্দ্রনাথের
'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'
সেই আকাঙ্ক্ষা।
একটা কিছু হয়ে-ওঠার ইচ্ছে মানেই
তুমি নবকুমার



দশ আঙুলের তোলপাড় উৎসাহে তোমাকে তুলে নিতে হবে
নিজেকে দীর্ণ করার কুঠার,
আর তোমার কৌতূহল, জানার ইচ্ছে
তোমাকে ক্রমশ হাঁটিয়ে নিজে যাবে বধ্যভূমির দিকে।
তুমি একা
যে-বজরার সমবেত উল্লাস তোমাকে পৌঁছে দিয়েছিল উপকূলে
নিরুদ্দেশ,
তুমি একা, ফাউস্ট যেভাবে একা
একা এবং উলঙ্গ
উলঙ্গ অর্থে প্রাকৃতিক
অর্থাৎ তুমিই তোমার শিকড়, ডালপালা এবং
জন্মবীজ।
অথচ কত সহজেই না কপাল থেকে মুছে ফেলা যেতো
লোহার চাকার দাগ
কত সহজেই না চোখে ভাসিয়ে রাখা যেতো
নীলকমল লালকমলের বরাভয় হাসি
যদি গলা মেলাতে পারতাম
সংবাদপত্রের চিৎকারে, মাইক্রোফোনে,
যদি তাৎক্ষণিক জয়ধ্বনি এবং উড়ন্ত পতাকাকে
ভেবে নিতে পারা যেতো দুর্লভ সার্থকতা,
পাপোশ থেকে এক লাফে পেয়ে যেতাম
এ বছর সিংহাসন-সদৃশ কাঠের চেয়ার
ও বছর রুপোর থালায় সোনার পদক।
মাঝে মাঝে তোমার সেই প্রিয় কবিকে
ভীষণ ঈর্ষা করতে ইচ্ছে করে আমার।

নন্দিনী

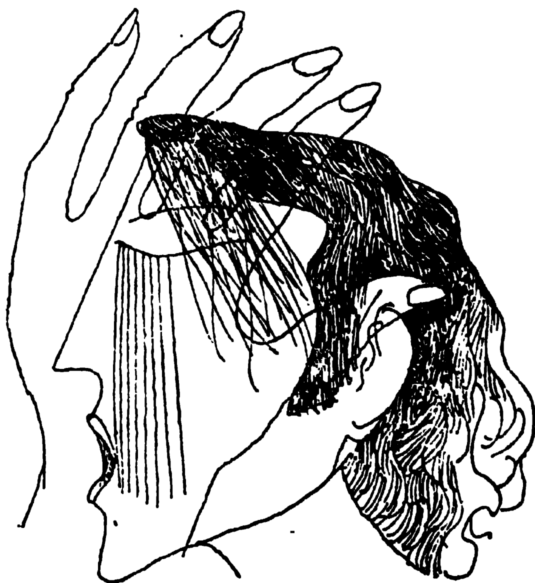
আমার প্রিয় কবি?
কার কথা বলছ তুমি?

শুভঙ্কর

তোমার প্রথম চিঠির শিরোনামায় টাঙিয়ে দিয়েছিলে
যার কোটেশন

নন্দিনী

সে কবেকার কথা।
খোঁটা দিয়ে খুব সুখ পাচ্ছ বুঝি?
কাকের পিঠে ময়ূরপুচ্ছের মতো
আকাদেমী তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিল যেদিন
তারপর থেকেই বিসর্জনের বাজনা।
বিশ্বাস করো, গা গুলিয়ে ওঠে এখন...



শুভঙ্কর

ক্রমশ স্তম্ভের মতো লম্বা হয়ে চলেছেন তিনি।
আর কী ঝকঝকে তকতকে নিরুপদ্রব তাঁর ভাবনার আকাশ
কত নিঃসংকোচ, অথচ দার্শনিক ভঙ্গিতে,
গত সাত বছর ধরে তিনি কমা এবং ফুলস্টপসহ
একই ভাষণ দিয়ে চলেছেন বঙ্গোপসাগরে, ব্রহ্মপুত্রে
এবং পুজো-প্যাণ্ডেলে।
আমার কতবার ইচ্ছে করেছে ছুরি কাটারি করাত
যা হোক একটা কিছুতে তার বুকটাকে চিরে
হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে চুরি করে নিই
ঐ অক্ষয় ফরমুলা,
যা মুঠোয় পেলে হয়তো ভুলে যেতে পারব
প্রতি মুহূর্তের আগুনে-ছেঁকা।
একটা হাসপাতাল
তার হাজার রকম রক্তপাতের ছিন্ন-বিচ্ছিন্নতা নিয়ে
কেবলই আমার চোখের সামনে
চোখ বুজিয়ে থাকলেও।
আজকাল আকাশের দিকে তাকাতেও
ভয় পাই আমি।
আকাশেও এক হাসপাতাল যেন
মেঘের পাঁজরে পাঁজরে সেই একই গোঙানি
অপারেশন থিয়েটারের দরজাগুলো
দমকা হাওয়ায় খুলে যায় যখন
সেই একই ছিন্নভিন্ন রক্তমাংসের জোড়াতালি।

নন্দিনী

শুভঙ্কর, লক্ষ্মীটি, প্লীজ,
হাসপাতালের কথাটা ভুলে যাও।

জানতাম কথায় কথায় ঠিক হাসপাতালে চলে আসবে তুমি।
হাসপাতাল বলতে কী বোঝাতে চাও
সে তো অজানা নয় আমার
যেহেতু তোমার গোপন ডায়ারির অনেক পাতাই আমার মুখস্থ।
নিশ্বাস নেবার পক্ষে যে-কোনো অযোগ্য আবহাওয়াই
তোমার কাছে হাসপাতাল।
যে-কোনো বৃহৎ সম্ভাবনার অপচয়ও।
ঐ হলদ হাসপাতালটা বহুদিন পাখির গান শোনেনি
এই বলে তুমি একবার আঙুল দেখিয়েছিলে
বিশাল বালুচরের ওপারে
হাজার মাইল শুকনো অরণ্যের দিকে।
আরেকবার এক নষ্ট এরোড্রোমের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে বলেছিলে
—জানো নন্দিনী,
একটা যুদ্ধ জয়ের জন্যে দরকার কতগুলো মৃতদেহ
সেই অঙ্ককষার জন্যেই
তড়িঘড়ি বানানো হয়েছিল এই হাসপাতালটা।

শুভঙ্কর

কাল সারারাত কী স্বপ্ন দেখেছি শুনবে?
পড়ছিলাম বালজাক।
তুমি তো জানো কীভাবে লিখতেন তিনি
প্রুফের উপর, প্রুফ কেটে-ছিঁড়ে,
আগের সমস্ত অক্ষরকে, যেন আগাছা,
এইভাবে উপড়ে, আবার নতুন করে বীজ বুনে ফসল ফলানো।
ভয়ংকর কোনো যুদ্ধক্ষেত্রের মতো তার বিরাট চেহারা।
সারা রাত স্বপ্নে সেই সব মৃত অক্ষরের বিলাপ,
সেই সব শব্দ এবং বাক্য
যাদের ধড় থেকে মাথাটা পড়েছে কাটা
কিংবা কোমর থেকে পা

অথবা মুখ থেকে চোখ,
তাদের সমবেত এবং প্রত্যেকের স্বতন্ত্র আর্তনাদে গোটা স্বপ্নটা
ভূমণ্ডলজোড়া এক হাসপাতাল যেন।
আর সেই সব আহত-নিহত শব্দমালার
শিয়রে শিয়রে উদভ্রান্তের মতো হেঁটে চলেছেন বালজাক।
নির্মাণ এবং সৃষ্টির মাঝখানে
সে যে কী দুর্বিষহ সংগ্রাম...

নন্দিনী

শুভঙ্কর, লক্ষ্মীটি, প্লীজ!
হাসপাতালের কথাটা ভুলে যাও।
হাসপাতালের কথায় তোমার নাড়ীর ভিতরে
তোবড়ানো এঞ্জিনের ধক ধক,
তোমার মুখের আদল ভেঙে আঠারো টুকরো
তোমার কণ্ঠনালীতে নিঃশব্দ চিৎকারের ওঠানামা।
শুভঙ্কর, প্লীজ,
নিজেকে এভাবে অসুস্থ কোরো না হাসপাতালের...

শুভঙ্কর

আমি ভুলে থাকতে চাই বলেই কিনা জানি না
যত বিকট সংবাদ
ইতিহাস কি বদলা নিতে চায় আমার উপর,
যত বিকট সংবাদ ঠিক আমার চোখেই।
পুরোনো লেখার খোঁজে ওল্টাচ্ছিলাম 'দেশ'-এর পাতা।
হঠাৎ শত্রুকে বাগে পেয়ে
আততায়ীর সশস্ত্র আক্রমণের মতো এই সংবাদ
শোনো
"যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিন স্টেট হাসপাতালে



একদিন এক রোগী এল গোড়ালি ফুলে যন্ত্রণা নিয়ে।
দৈহিক পরীক্ষা সমাপ্ত করতে করতেই
চিকিৎসকেরা তার পাকস্থলী থেকে বের করে
ছাব্বিশটা চাবি
তিন সেট জপের মালা
ষোলোটি ধর্ম সম্পর্কীয় মেডেল
একটি ব্রেসলেট
তিনটি ধাতব শিকল
একটি বীয়ারের বোতল-খোলা চাবি
একটা ছুরির ফলা
উনচল্লিশটা নখ-কাটা উখো
চারটি নেল-কাটার
আটচল্লিশটা নানা ধরনের মুদ্রা।"
বিশ্বাস না হয়, দেখে নিতে পারো

পড়ামাত্রই ভয়ের থাবা একদম টুঁটির উপর
নিজের অজ্ঞাতসারে কী জমে উঠেছে
আমার পাকস্থলী কিংবা হৃৎপিণ্ডে...

নন্দিনী

কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, শুভঙ্কর
ভয় পাওয়ার মতো কিচ্ছু জমেনি কোনোখানে।
একটু চুপ করে বোসো তো।
আমি গান গাই, শোনো।
কি গাইব বলো?
আমার সকল দুখের প্রদীপ
জ্বেলে করব নিবেদন,
গাইব?
বেশ, গান ভালো না লাগে তো কবিতা শোনো।
তোমাকে দেব বলেই পরশু কিনেছি লোরকার কবিতা।
"Heaven-murdered one,
among shapes turning serpent..."
না, এটা নয়।
এতে বড্ড মৃত্যুর গন্ধ।
এটা শোনো—
"Under the multiplications
is a drop of duck's blood
Beneath the divisions
the sailor's blood-drop."
ওঃ, আবার সেই রক্তের ছড়াছড়ি।
রক্ত আর মৃত্যু আর সাপের খোলস।
পৃথিবী থেকে প্রেমের কবিতা কি মুছে গেল নাকি?
গোলাপ, গোলাপ কি আর আলোকিত ঝরনা নয়
কোনো কবির চোখেই?

শুভঙ্কর

একবার ছাপানো বইয়ের পাতা থেকে
আমার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল সহমরণের দৃশ্য
জ্বলন্ত চিতার আগুন এবং ধোঁয়া সহ

নন্দিনী

তোমার মনে পড়ে শুভঙ্কর
গঙ্গার ধারে সেই ডাকাত হাওয়ার রাত,
তোমার হাত আমার বুকের বোতামে
আমার গালে তোমার ড্রাগনে নিশ্বাস

শুভঙ্কর

সমস্ত নয়, অন্তত কিছু মানুষের মুক্তির কথা ভেবে
একবার এক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের স্তূপীকৃত কাঁটাতার
গোপনে আশ্রয় নিয়েছিল আমার বুকে।



নন্দিনী

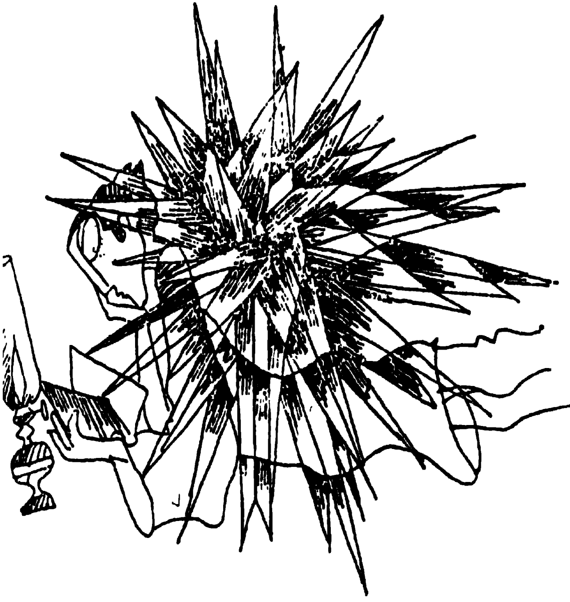
ওসব বাজে কথা রাখো।
শোনো, মনে পড়ছে
রাজগীরের সেই দীপাবলীর রাত?
এক্কায় ফিরছি
তোমার ঠোঁটের অঝোর বৃষ্টিতে, শ্রাবণে ভিজে,
ভাসতে ভাসতে...

শুভঙ্কর

ভিয়েতনামের ভাঙা দেওয়ালে
গুলিবিদ্ধ হয়েও জ্বলতে থাকা ভাঙা হ্যারিকেন,
উড়ে-চলা আণবিক মেঘের কিছু পুঞ্জ
পুরুলিয়ার আকাশে
পিকাশোর মৃত ঘোড়ার হ্রেষা
আরও কত রকম দুঃস্বপ্নের ছেঁড়া ডানা
হৃতসর্বস্ব সময়ের নানান রকম শোক তাপ
এবং সংকল্প এবং সংগ্রাম
এদেরই সমষ্টিগত যোগফল হয়তো আমি।
নিজেকে এইভাবে তলদেশ পর্যন্ত খুঁড়ে দেখতে
আমার ভালো লাগে না নন্দিনী,
আর এইজন্যেই হাসপাতালকে আমার এত ভয়।

নন্দিনী

কেন তুমি নিজেকে এইভাবে
চুরমার করছ শুভঙ্কর?
এই নাও, মাথা রাখো আমার কোলে,
মনে করো আমি নন্দিনী নই



রূপোলি জলের কোনো দীঘি
তুমি ডুবে যাও আমার ভিতরে
স্নান করো, স্নান করো শুভঙ্কর
স্নিগ্ধ হও।

শুভঙ্কর

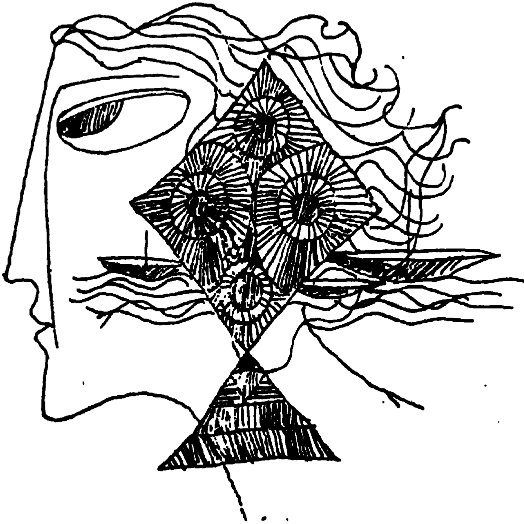
হাসপাতাল তার যাবতীয় মুদ্রাদোষসহ
গভীর গর্তটা খুঁড়ে ফেলেছে আমার স্বভাবে।
চোখে অণুবীক্ষণ লাগিয়ে
একটা সামান্য রক্ত-কণিকারও
নাড়ী-নক্ষত্রের খোঁজ পাওয়া চাই তার।
আগে কখনো এমন ছিলাম না আমি

প্রকৃত জলাশয়ের স্তব্ধতা এবং সারল্য ছিল যে বাঁশিতে
তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তুমুল বৃষ্টিপাতের শব্দ।
এখন সামান্য কাজও আমার কাছে পারাপারহীন।
যে অঙ্কের ফলাফল হবে মাত্র তিন
সেই ফলাফলে পৌঁছনোর তাগিদে
অঙ্কের অজস্র স্তর, ধাপের পর ধাপ
কোনটার কী ব্লাড-গ্রুপ
যতক্ষণ না জানিয়ে দিচ্ছে তল্লাসী রিপোর্ট
নিজের অসম্পূর্ণতায় আমি অতিষ্ঠ।
এখনো বুঝি নির্মিত হইনি পুরোপুরি
এই বোধ আমাকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করে দেয়
বৃক্ষলতার উৎসব থেকে,
অন্তরীক্ষের অমোঘ ভারে কেবলই নুয়ে থাকা
অঙ্কের দিকে, অক্ষরের দিকে
অণুবীক্ষণের নীচে
পৃথিবীর ক্রমাগত রঙ বদলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকে।
বাল্যকালের লাল-নীল ঘুড়িটা ওড়াতে পারি না আর
হৈ হৈ সমুদ্রে স্বতঃস্ফূর্ত জলযান হতে পারি না আর
এমনকি তুমি
আমার দ্রাক্ষা এবং অগ্নিমূল
তোমার কাছে পৌঁছতেও অসম্ভব দেরি হয়ে যায় আমার।
সারা অপরাহ্ণ দিগবিজয়ের দুন্দুভি বাজিয়ে
বিকেলের রক্ত-আলোয় হঠাৎ এই জেনে-যাওয়া যে,
এখনো সম্পূর্ণ হয়নি আমার নির্মাণ
এর অগ্নিতাপে নাড়ী শুকিয়ে যায় নন্দিনী।

নন্দিনী

দয়া করো শুভঙ্কর
জীবনে আর-একবার সুযোগ দাও আমাকে

আমি দর্পণ হই
পৃথিবীর স্বচ্ছতম দর্পণ
আর তুমি নিজেকে দেখে নাও সম্পূর্ণ।
বিরোধে বিরোধে, দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে
আত্মসংঘাতের জটিলতায়
নিজেকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী
এবং অস্ত্রাঘাতের যোগ্য প্রতিপক্ষ ভেবে নিয়ে
মিথ্যে রুয়ে চলেছ ক্ষয়ের ঘূণ।
একবার, এবং এই শেষবারের মতো
আমাকে দাও তোমার অগ্নিজটাময় চুল
দেখো আমার চিরুনিতে তারা ফিরে যায় কিনা পুরোনো শৃঙ্খলায়।
আমাকে দাও তোমার শীর্ণ বাহু
আর পাঁচ আঙুলের রুগ্‌ণ ডালপালা



দেখো আমি তাদের সর্বাঙ্গে পরিয়ে দিতে পারি কিনা
বসন্তকালীন উৎসবের সাজ।
দীর্ঘ সৈকত
লাল কাঁকড়ার অবিরল নতুন নতুন সুখের গর্ত যেখানে
বালি আর ঝিনুকের কারুকাজ মিলেমিশে মায়াবী কিংখাব
আর তাদের ছুঁয়ে নীল জলরাশির
যে উৎফুল্ল এবং বিধ্বংসী সমুদ্র
একবার ভাসতে দাও এই বেহুলাকে সেই
দেখো পারি কিনা ধুয়ে দিতে তোমার রক্তের সংক্রামিত বিষ।
শুভঙ্কর!
যতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো
ভালোবাসা এখনও সাবিত্রী
মৃত্যু অথবা মৃত্যুর মতন যে-কোনো ধ্বংসের উদ্ধার মন্ত্র সে এখনো।
প্রবলতম অনাবৃষ্টির পরও
এত বীভৎসতম সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তির পরও
তার কপালে চির-এয়োতীর সিঁদুরটিপ।
ভালোবাসার কাছে ফিরে এসো শুভঙ্কর।
ভালোবাসা মানে সেই আবীরবর্ণ আদিত্য
পৃথিবীর স্থলভাগের মাথায় যে পরিয়ে দেয়
সহস্র-শিখা মুকুট
আর জলভাগের গলায় সপ্তরশ্মির
সাতনরী হার।

শুভঙ্কর

ভালোবাসার অলৌকিক প্রতিভা সম্বন্ধে
আমি সন্দেহহীন নন্দিনী।
যে-কোনো দুরভিসন্ধির গহ্বরের উপরে
সে যে কাঠের সাঁকো কিংবা লোহার ব্রীজ
এপার থেকে অন্য অগম পারে পৌঁছে দেবার সোনালি সেতু



সে তো স্মরণীয়ভাবে জানা।
কিন্তু তার পরও পার হতে বহু দিগন্ত।
বহু দূরান্তকে অতিক্রম না করে
বলো কোন মহাপথিক কবে পৌঁচেছে
তাঁদের নিজের নিজের স্বর্ণশিখরে?
সেই স্বর্ণশিখর, যাকে রিলকে বলেছেন
'সুদূরের প্রান্তের শেষ বাড়ি।'
আরও একজনের কথা মনে পড়ছে এখুনি
আমার প্রিয় পরিচালক, বার্গম্যানের কথা
তিনি বলেছিলেন
'সবচেয়ে মারাত্মক পথগুলিই হাঁটার একমাত্র পথ।'
একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে
সমগ্র জীবন জুড়ে যাঁদের হাঁটা,
তাঁদের প্রত্যেকের পায়ে রক্তক্ষরণের ক্ষত

তীক্ষ্ণ পেরেকের এফোঁড়-ওফোঁড় গর্ত
তাঁদের হাতের তালুতে কিংবা জঙ্ঘায়।
ধারাবাহিক এগিয়ে চলা
প্রতিদিন তৃণের তারুণ্যে সজীবতার সংকল্প
একবার তাঁবু ফেলেছে যার চেতনার চাতালে
তার আর শান্তি নেই, নিদ্রাসুখ নেই,
কোনো দিনও স্নিগ্ধ হবে না তার স্নান।
আবার রিলকের কথাতেই বলি—
'দুই হাতুড়ির মাঝখানে এই হৃদয়
যেমন দুপাটি দাঁতের মাঝখানে জিভ
অথচ আমাকে হতে হবে বন্দনা-মুখর।'

নন্দিনী

আমিও তো তোমাকে সেই কথাই বলতে চাই
তোমাকে হতে হবে বন্দনা-মুখর।
কিন্তু তুমি যদি ভালোবাসতেই ভুলে যাও শুভঙ্কর
কী করে রচনা করবে সৃষ্টির জয়গান?
গ্যেটে, যখন তিনি অতিক্রম করে গেছেন সৃষ্টির মহাকাশ
এবং প্রৌঢ়ত্বের সীমা
তখনও এক পূর্ণিমায়-পৌঁছনো পঞ্চদশীর ভালোবাসা পেতে
আকুল বালক।
টমাস মানের 'ডেথ ইন ভেনিস'-এর পিছনে
তুমি নিশ্চয়ই জানো
সেই ইতিহাসের পাতলা ছায়া।

শুভঙ্কর

তোমাকে যে ঠিক কী ভাবে বোঝাব
নন্দিনী, খেই হারিয়ে যায়।

কত বর্ষা-বসন্তে এক দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছি
যেখানে তুমি।
যেখানে তুমি, সেখানে আদরখাকি টিয়ার মতো
তোমাকে ঘিরে প্রকৃতির সাতশো ছলাকলা।
যেখানে তুমি, সেখানেই নিশ্চিন্ত এবং অভিভূত ঘুমের
শীতল ছায়াতট।
কতবার পরিত্রাণের জন্যে হাঁপিয়ে উঠে
মনে মনে উচ্চারণ করেছি এই আবেদন
—হে অনন্ত নীলিমা,
আর কিছু প্রত্যাশা কোরো না আমার কাছে
আমি এখন রুপোলি থালায়
সোনালি আপেলের উপর ঝুঁকে।
হে অনাগত কাল
মুছে দাও আমার নাম
আমি আর নেই আত্মউন্মোচনের অস্থির দ্বন্দ্বে



নেই খনন-ধর্মী শ্রমে।
আমি এখন দ্রাক্ষা ক্ষেতে রক্তিম মদের গেলাসে,
আমার ভিতরে চিতোর মিনারের মতো
উঁচু-হয়ে-ওঠা খিদে।

নন্দিনী

তখনই কেন চলে আসনি আমার কাছে?
তুমি তো জানোই
আমার শরীর জুড়ে তোমার চিরদিনের
বাসরঘর।

শুভঙ্কর

হায়! নন্দিনী!
পরিত্রাণ নেই তবুও।
ছায়ার পিছনে ছায়ার মতো এক বিচারালয়।
আসনহীন আসনে মূর্তিহীন বিচারক।
কণ্ঠহীন কণ্ঠস্বরে তাঁর প্রশ্রয়হীন প্রশ্ন।
যদি এমন হতো যে পৃথিবীর, নক্ষত্রের, জলরাশির
বৃক্ষের, আলোকের
অর্থাৎ সমস্ত বস্তুপুঞ্জের
শুধু বহিরাবরণের বর্ণনাতেই তিনি তুষ্ট,
অনেক সহজ হয়ে যেতো উত্তরমালা।
কিন্তু তিনি জানতে চান সম্পর্ক।
তুমি যে আপেলটি খাও সে আপেল নয়,
সেজানকে একদা সেই অদৃশ্য কণ্ঠের প্রশ্ন,
যে আপেলের ভিতর দিয়ে শতশতাব্দীর আকাশ
এবং সপ্তসিন্ধুর যাতায়াত,
যে আপেল নিজের নশ্বর শাঁসকে



রূপান্তরিত করেছে সূর্য এবং পৃথিবীর আদলে,
সেই আপেলের সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার?
আপেল আঁকতে গিয়ে সেজানকে তাই
ঢুকে পড়তে হয়েছিল আপেল-সত্তার ভিতরে।
কিছু রচনা করা মানেই
তোমাকে একবার ঢুকতে হবে বিশ্বের সত্তায়
আরেকবার অক্ষরের সত্তায়।
যেহেতু অক্ষরের হেরফেরেও রক্তহীন হয়ে যায়
মানুষ এবং বিশ্বের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক।
এইভাবেই ক্রমাগত কঠিন হয়ে উঠছে আমার অধ্যয়ন, আত্ম-সংগঠন

কঠিনতর হয়ে উঠছে নিজের রচনার ভিতরে
নিবু নিবু পঞ্চপ্রদীপকে স্থির শিখায় জ্বালিয়ে রাখা।

নন্দিনী

আমার কাছে আরো একটু থাকো শুভঙ্কর।
হাওয়ার বিরুদ্ধে এই আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি
আমার দীর্ঘ আঁচল,
স্থির আলোকশিখার নীচে তুমি মগ্ন হও
তোমার নির্মাণে ও সৃষ্টিতে।

শুভঙ্কর

আমার কাগজে-কলমে তোমার রোদ
আমার জানলায় তোমার আকাশময় হাতছানি।
ওলোট-পালোট হাওয়া
আমার দেওয়ালে দেওয়ালে উল্কি-চিহ্নে এঁকে যায়
তোমার নানা মুহূর্তের স্মৃতি
আমার অক্ষরমালার ভিতরে জেগে থাকে
তোমার চোখ, যা সব সব সময়েই
সুপ্রভাতের মতো উন্মোচনের আগ্রহে কম্পমান।
তবু নিজের থেকে নিজে পালাই কী করে, নন্দিনী?
আমার শিকড় আমাকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে চলেছে
গভীরতর ভূদৃশ্যের অভ্যন্তরে।
আমাকে সহস্র টুকরোয় ছিঁড়ে ফেলছে
অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা এবং শাশ্বত সম্পর্কে বোধ।
আমি আক্রান্ত, নন্দিনী,
এবং আমিই আমার সবচেয়ে পরাক্রান্ত আক্রমণকারী।

আমরা আবহমান ধ্বংসে ও নির্মাণে

(রজত বন্দ্যোপাধ্যায়কে)

....

শুভঙ্কর

কাল রাত্রে কোনো আর্তনাদ শুনেছিলে তুমি?

নন্দিনী

কখন?

শুভঙ্কর

ঘাসের কাঁথায় ঘুমোতে আসে শিশির,
আর পৃথিবীর কণ্ঠনালী থেকে
শেষ শব্দটুকুকেও চেটেপুটে খাওয়ার লোভে
সময়ের ভিতর থেকে লাফ দেয়
কুচকুচে হুলো বেড়ালটা,
মাঝরাতের সেই রকম একটা সময়।
যেন অতর্কিত বন্যায় ডুবে যাচ্ছে জনপদ
আর্তনাদটা ছিল
এই রকম মর্মান্তিক
আর প্রতিধ্বনিময়।

ঘুম ভেঙে গেল।
সঙ্গে সঙ্গে চোখে নাড়ী-ছেঁড়া যন্ত্রণা।

নন্দিনী

এই তো সেদিন চশমা বদলালে শুভঙ্কর
আবার কিসের যন্ত্রণা?

শুভঙ্কর

এই তো সেদিন কাচিয়ে আনলে শাড়ি
তবুও ময়লা কেন নন্দিনী?
এত বোঝো
আর এইটুকু বোঝো না
সময় যখন দৌড়োয়
তার ধুলো-বালি, জল-কাদা, স্প্লিনটার
তার আগুনে নিশ্বাস
তার অট্টহাসি
তার শাপ-শাপান্ত
আছড়ে পড়ে আমাদের গায়ে, পায়ে, জামা-কাপড়ে
চেতনার অলি-গলিতে
জানলা-দরোজায়, দেয়ালে।
তোমার শাড়িতে যেমন সংসারের ময়লা
আমার চোখে তেমনি সময়ের আঁচড়।

নন্দিনী

এত জানো
আর এইটুকু জানো না শুভঙ্কর
কোনো মানুষই তার অতীতকে বাদ দিয়ে নয়।



প্রত্যেক রাত্রে স্বপ্ন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়
গাঢ় খয়েরি রঙের একটা সুড়ঙ্গে
তার লম্বা গুহার হিমমণ্ডলে।
তোমার বাল্যকালের ভিজে সব জামা কাপড়
সেইখানে,
রক্তের কষ-লাগা সব পালক
আর যৌবনের সেই সব ভাঙা কাচের টুকরো
যারা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছিল সূর্যরশ্মি।
এমন-কি তোমার
না-লেখা পাণ্ডুলিপির
শব্দ, স্মৃতি, জ্বলন্ত ধূপদানিও সেইখানে।
বুনো মহিষের বাঁকানো শিং-এর মতো
অতীত এসে তোমাকে টানে যখন
প্রবল জোরে তার মুখের উপর ভেজিয়ে দিতে চাও

তোমার বর্তমানের দরোজা।
যখন পারো না
তখনই হেরে যাওয়ার আতঙ্কে
বিছানা বালিশ ছিঁড়ে তোমার আর্তনাদ।

শুভঙ্কর

আমার আর্তনাদ?
রোজ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়
আর ঘুম ভাঙলেই
চোখের ভিতর যন্ত্রণার অগ্নিকাণ্ড,
সে কি আমারই আর্তনাদ শুনে?

নন্দিনী

হ্যাঁ, শুভঙ্কর।

শুভঙ্কর

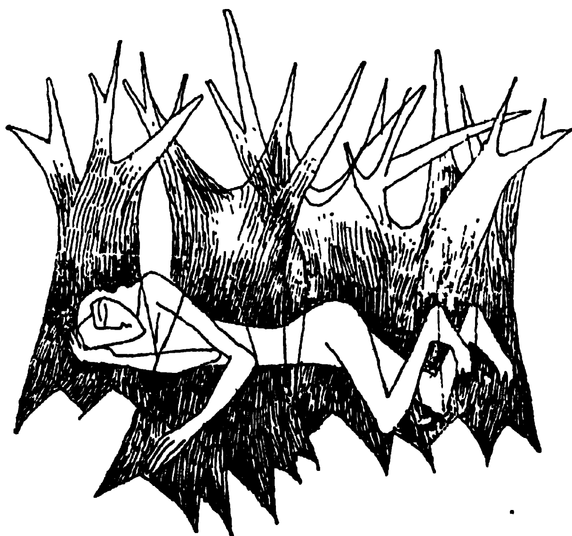
আর আমি ভাবতাম
প্রসব যন্ত্রণায় কাঁদছে কোনো পাহাড়
মা হতে চেয়ে।
আমি ভাবতাম
প্রকাণ্ড এবং বিস্ফোরক কোনো বৃক্ষের বীজ
থেৎলে যাচ্ছে বুঝি ছুটন্ত গাড়ির চাকায়।
হয়তো বা ভূমিকম্পের ভয়ে বেজে উঠেছে
আতঙ্কময় শাঁখ।
নন্দিনী!
আর্তনাদের মধ্যে কী বলি আমি?

নন্দিনী

জটিল এক জঙ্গলের কথা।

শুভঙ্কর

কোন জঙ্গলের?
বীরভূমের না ধলভূমের?
দিনগুলো যখন ধনুকের মতো বাঁকা
তখন সাববন্দী ক্যাম্পখাটগুলো পাতা থাকত
এক জঙ্গলে।
আরেক জঙ্গল
আমাদের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল
উপোসী অজগরের জিভ।
তখন রাহুর হাতে সমস্ত আকাশ



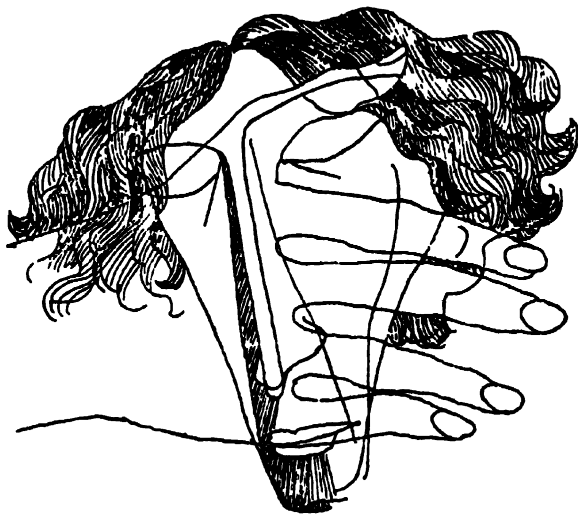
বাতাসের ভাঁজে ভাঁজে ত্রাস
নক্ষত্র লুকিয়ে থাকে
মেঘের জঙ্গলে বারোমাস।
গুপ্তঘাতকের ছুরি হাতে নিয়ে
প্রতিহিংসাবোধ
গাছের বল্কল কেটে ছিঁড়ে
ডাল ভেঙে পাতা চিরে চিরে
শিকড়ের রক্তনাড়ী শ্বাসকষ্টে ঘিরে
তন্ন-তন্ন খুঁজে ফেরে সে-জাতীয় রোদ
যারা জানে
কত জলে গর্ভবতী হতে পারে মাটি
যারা জানে
কুসুমের গর্ভকেশরের
কোন গোপনীয় ঘরে
বারুদের ঘাঁটি।
১৯৭১ থেকে ১৯৭৬ ক' বছর নন্দিনী?

নন্দিনী

পাঁচ।

শুভঙ্কর

পুরো পাঁচটা বছর জঙ্গলে,
অজ্ঞাতবাসে।
অন্ন বলতে, আলোর জাফরান
অস্ত্র বলতে, ঝকমকে জিজ্ঞাসা।
আর বিছানা বলতে খরা মাটির মরা ঘাস।
উদ্দেশ্য বদলে গেলে
জীবনযাপনও বদলে যায় কী অদ্ভুত।



নন্দিনী

জানি।
নিষিদ্ধ বোদেব প্রিয ডাকে
একদা তোমাকে
গৃহস্থেব জলচৌকি ছুঁড়ে ফেলে
নিরাপত্তাহীন
ছুটে যেতে হযেছিল সাপেব জঙ্গলে।
তখন দুর্দিন
ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো।
ব্যাধের হরিণ
যে-ভাবে জড়িয়ে থাকে
বনের বিশ্বস্ত ডালপালা
সেইভাবে ক্ষয়, ক্ষতি, ক্ষত, জ্বর, জ্বালা
শরীরে জামার মতো আঁটা।

সন্ত্রাসের কাঁটাতার ভেঙে-ছিঁড়ে হাঁটা।

শুভঙ্কর

একদিন যেতে যেতে যেতে
আমাকে একলা পেয়ে
খরায়-চিবিয়ে-খাওয়া ক্ষেতে
অদৃশ্য আগুনে লেখা ইস্তেহার, গোপন-সংবাদ
আমার চোখের মধ্যে রয়ে গেছে ভেবে
চোখের কোটর থেকে
চোখ দুটো ছিঁড়ে-খুঁড়ে নেবে
এই ভেবে ছুঁড়ে গেল বন্দুকের
বর্শা-ফলকের
হিংস্র-ঝলকের
অগ্নিকণা।

নন্দিনী

সেই থেকে চোখের যন্ত্রণা।
শুভঙ্কর!
আমি তো জানি কেন তোমার পালানো।
মা-বাবা, ভাই-বোনের
সুস্থির সংসারকে শোকে জ্বালানো,
কিসের টানে।
প্রাণে
গর্জন তুলেছিল কোন্ হাওয়া
কিসের জন্যে দৌড়ে যাওয়া।
বিপজ্জনক বাঁকে।
হন্যে হয়ে খুঁজেছিল কাকে
দুপুর রোদে গা পুড়িয়ে।

শুভঙ্কর

মানুষ, নন্দিনী
শুধু মানুষ।
উত্তাল ঝড়-ঝাপটায়
কেরোসিন-কুপীর শিউরে-কাঁপা শিখার নীচে
দুঃখিত মানুষের মুখগুলো।
তাদের স্যাঁতসেঁতে চামড়ায়
শস্য এবং ডিজেলের গন্ধ,
তাদের ঘামের নুনে
অভ্রের ঝিলিক,
তাদের হাতের চেটোয়
কোদাল কুড়োল এবং ইঞ্জিন-চাকার ছাপ।
এই সব মানুষের মুখের দিকে তাকালেই



আমার দেখা হয়ে যায়
আকাশ, মেঘ, পর্বত-চূড়ার পিছনে সূর্যোদয়
দেখা হয়ে যায় নতুন নতুন বৃক্ষের জন্ম
বৃক্ষকে ঘিরে
জ্বলজ্বলে জনপদের বিকাশ।

নন্দিনী

আর সেই সব মানুষ যখন নিহত হয়?
যখন ভুল অপরাধের শিকার হয়
আঠারো বছরের পলাশ
অথবা আটচল্লিশের স্থলপদ্মেরা?
যখন দাঁতালো কুকুরের ছায়ার নীচে
মানুষ শুকনো ঝাউপাতা?
আদিম বুলডোজার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে যখন
মানুষের ভাঙা শিরদাঁড়ার দিকে?

শুভঙ্কর

রক্তের মাদুরে শুয়ে থাকা
অনেক মানুষ দেখেছ তুমি।
তাদের দিকে তাকিয়ে
কী মনে হয়েছে তোমার নন্দিনী?

নন্দিনী

আমার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে উঠেছে ঘৃণায়
ধিক্কারে।
সমস্ত জীবন থুতু ছিটিয়ে যাব
এমনি প্রতিজ্ঞা

পবিত্র ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে উঠেছে
আমার হৃৎপিণ্ডে।

শুভঙ্কর

আর আমি উপহার দিতে চেয়েছি
আমার পাঁজর
আমার রক্ত চলাচলের শিরা-উপশিরা
আমার শ্বাসপ্রশ্বাস।
কিন্তু নিতে পারেনি তারা।
মৃতেরা বলতে পারে না নিজেদের বাঁচার কথা।
তাই আমাদের হয়ে যেতে হয়
মৃত জীবনের অংশীদার।
তাদের বুক, বুকপকেট
তাদের হাড়-মাংসের ফুটো-ফাটা ঘেঁটে
আমাদেরই খুঁজে নিতে হয়
ঠিকানাপত্র
গোপন ডায়েরি
আচমকা থেমে-যাওয়া উচ্চারণ
ভাঙা চশমার ফাটলে
লতাপাতার মতো জড়িয়ে থাকা
আশা-আকাঙ্ক্ষার ছক।
আগে-মরা মানুষেরাই তো
পরে-মরা মানুষদের জন্যে গড়ে দিয়ে যায়
যাতায়াতের নতুন মানচিত্র
ভিন্ন বাঁকের নদী
বিরতিহীন রেলপথে জিরিয়ে-নেবার জংশন
আর ঘাস ফড়িংয়ের পিঠে
উড়োজাহাজের অকুতোভয় ডানা।
নন্দিনী!

বুনো জঙ্গলে
মৃত সহযাত্রীদের রক্তপ্লাবনের মধ্যে
উপুড়-হয়ে-থাকা আমাকে
তুমি যখন তুলে নিলে নিজের হাঁটুতে
আমার তখনকার সেই তছনছ মুখের দিকে তাকিয়ে
কী দেখেছিলে তুমি
সে-কথা কিন্তু বলনি কোনোদিন।

নন্দিনী

ধ্বংস! ধ্বংস! ধ্বংসের বিসদৃশ
দৃশ্য দেখেছি তোমার নবীন মুখে।
দেখেছি রক্ত-পিপাসাকাতর ছুরি
কী ভাবে আকাশ ফালি ফালি করে ফ্যালে।
মনে হলো তুমি শুয়ে আছ হিরোসিমা
তুমি গের্নিকা, দীর্ণ ভিয়েতনাম
পিকস্কিলের দাঙ্গা তোমার মুখে
কালো আফ্রিকা, তোমারই অন্য নাম।
পল রবসন, গারথিয়া লোরকার
পঙ্‌ক্তির মতো, বেদনায় ভারাতুর।
অথচ ভিতরে গুমরে গুমরে ওঠে
ক্রুদ্ধ গীটার, আগ্নেয় যার সুর।
ছিন্ন-ভিন্ন শরীরের ক্ষত ছুঁয়ে
অন্ধ বনের আলো ও অন্ধকার
নেচে চলেছিল এমন ভঙ্গিমায়
যেন রক্তের জলধি পেরিয়ে জাগছে নতুন ডাঙা।
সেদিন তোমার মুখের আদলে আমি
দেখেছি মেঘলা দিনের সূর্যালোক
তীরন্দাজকে ছুঁড়ে মারে নীল হাসি
তোমার দুচোখে এমন পাখির চোখ।



শুভঙ্কর

তারপর?
তখন বারুদ-গন্ধের ভিতরে শুয়ে
জিভে চৌচির কপাল থেকে চোয়ানো রক্তের নুন
চোখে হাজার খানেক আলপিনের তুড়িলাফ
জীবিত কি মৃত নিজেও জানতাম না আমি
শুধু মনে হচ্ছিল আততায়ীদের অট্টহাসিকে চিরে চিরে
কার একটা সবুজ হাত ক্রমশ এগিয়ে আসছে কাছে।

নন্দিনী

তারপর থেকে কী ঘটেছে সে কি অজানা তোমার?

শুভঙ্কর

দিয়েছ বিশাল সিন্ধুর জল এবং সাঁতার।

নন্দিনী

বিনিময়ে তুমি দিয়েছ সৌরলোকের হাওয়া

শুভঙ্কর

শিখর-ছোঁয়ার সঠিক লগ্নে তোমাকে পাওয়া।

নন্দিনী

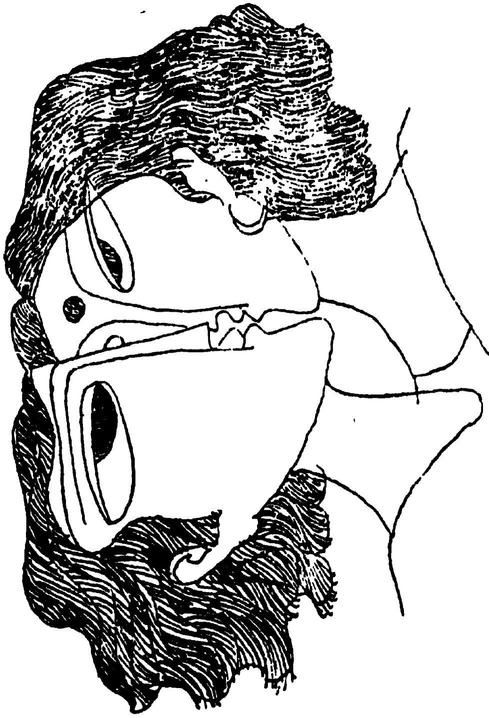
তোমার স্তব্ধ নিশ্বাসও যেন মহাকল্লোল
রাজহংসের উল্লাসে কাঁপা আকাশের কোল।

শুভঙ্কর

তোমার মনের মূর্তিকে শত গড়ি ও ভাঙি
ক্রমশই এক ক্ষমতাদীপ্ত আলোয় রাঙি।

নন্দিনী

মেঘ, মৃত্তিকা দুটোকে ছুঁয়েই তোমার শিকড়



শুভঙ্কর

তুমি সাবিত্রী! মৃতের কণ্ঠে এনে দাও স্বর।

দুজনে একত্রে

আমরা আবহমান
রয়ে গেছি পৃথিবীর ধ্বংসে ও নির্মাণে,
আকাশ, মাটি ও জল
আমাদের আন্দোলিত ইতিহাস জানে।

ভাস্কর্য্যের ভাঙা হাত